আলোচনা: মহুয়া — দীনেশচন্দ্র সেন

আমি যখন এম. এ. ক্লাশের ছাত্রদিগকে পড়াইতাম তখন প্রতি বৎসর নবাগত ছাত্রদিগকে এই একটী প্রশ্ন করিতাম—'নদের চাঁদ ও মহুয়া-উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত ছিল, তোমরা কাহাকে উচ্চস্থান দিতে চাও, প্রেমের ত্যাগ হিসাবে কাহাকে বড় বলিবে?'

অধিকাংশ ছাত্রের এক উত্তর, নদের চাঁদ শ্রেষ্ঠ, বেদের মেয়ের ত্যাগ তো কিছুই নহে। এত রূপ, এত গুণ, এত ঐশ্বর্য, এত বড় বামুনের কুল—সে সমস্তই তো বিসর্জন দিয়াছিল নদের চাঁদ এই বেদের মেয়ের জন্য। মহুয়া আর তেমন কি করিয়াছে? ... ঘুরিয়া ফিরিয়া নদের চাঁদের মহিমাকীর্তনই অনেক ছাত্র করিতেন।

কিন্তু দুই-একটী ছাত্র মহুয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার বলিতেন — যাহার যাহা আছে সে তাহা ত্যাগ করিলে যথেষ্ট ত্যাগ হয়, ফকির কখনও রাজ্য ত্যাগ করিতে পারে না, সে যদি তাহার ভিক্ষার ঝুলিটী ত্যাগ করে, তবেই বুঝিতে হইবে, তাহার সর্বপেক্ষা বড় ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং মহুয়া যদি রাজপদ ত্যাগ না করে, তবে তাহাকে ছোট বলা যায় না। এখন দেখিতে হইবে, তাহার যাহা কিছু তাহার সমস্তখানি তাহার প্রেমাস্পদের পায়ে সে দিতে পারিয়াছিল কি না। রাজপুত্র বনে যাইয়া মহুয়ার জন্য ছয়মাসকাল অকথ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ছয়মাস মহুয়া কি করিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে।

এই ছয় মাস মহুয়া আঁচল পাতিয়া ভূমিশয্যায় শুইয়াছে, সারারাত্রি সে একটুও ঘুমায় নাই। মাথার ব্যথা ছুতো করিয়া সে একদিনও রান্নাবাড়া করে নাই, হয়ত বন্য কোন কষায় ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। সে তাহাদের দলের লোকের সঙ্গে খেলা দেখাইতে যায় নাই, কোন কৌতুক করে নাই, নীরবে কাঁদিয়াছে এবং মৃতের মত ঘরের এক কোণে পড়িয়া ছিল, যেদিন নদের ঠাকুর আসিলেন সেদিন অকস্মাৎ সে সজীব ও সক্রিয় হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গীরা দেখিয়া বিস্মিত হইল—

'ছয় মাসের মড়া যেন সামনে হৈল খাড়া।'

তাহারা মহুয়ার আকস্মিক কর্মঠতার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।

সুতরাং নদের চাঁদ ছয়মাস বনজঙ্গলে ঘুরিয়া যে কষ্ট সহিয়াছেন, মহুয়া সেই বন্যদেশের নিভৃত কুঁড়ে ঘরে পড়িয়া তাঁহার জন্য কম কষ্ট সেহে নাই।

নদের চাঁদ প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন, বড় মানুষের ছেলে আদরে লালিত। তাঁহার আবদারের অন্ত নাই। যখন তাঁহার ভালবাসা জন্মিল,

তখনই সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। সেই যে দড়ির উপর কলসী লইয়া নৃত্যের সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন 'পড়্যা বুঝি মরে', প্রথম পরিচয়ে এই দুশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের অগ্রদূত। মহুয়াকেও প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হইতে দেখিতে পাই। তিনি খেলা সাঙ্গ করিয়া অনেক কিছু পুরষ্কার চাহিলেন, কিন্তু মনে মনে বলিলেন – 'নদের ঠাকুরের মন যেন গো পাই'। উভয়েই উভয়ের প্রতি প্রথম দর্শন হইতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নদের চাঁদের কোন সংযম ছিল না, তিনি প্রেমের মহাম্বুধিতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া ভাসমান একটী তৃনের মত অদৃষ্টের পথে চলিয়াছিলেন। এই গতি কোথায় থামিবে, কিম্বা কোন লক্ষ্যে তাঁহাকে পৌঁছাইবে এ-সকল তাঁহার মনে উদয়ই হয় নাই। তিনি প্রেমদেবতার হাতের একটা পুতুলের মত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কোন শঙ্কা ছিল না, তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। প্রেমধর্ম তাঁহাকে অপূর্ব সহ্যগুণ দিয়াছিল, ভালমন্দের বিচার, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার, ভবিষ্যতের চিন্তা, নিজ সুখদুঃখের জ্ঞান, বিপদের আশঙ্কা – এ সমস্তই তাঁহার লুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং নদের চাঁদ যে প্রামের আদর্শ হিসাবে কাহারও অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন ছিলেন, তাহা বলা যায় না। প্রেমদেবতার পদে সর্বস্ব অর্ঘ্য দিয়া তিনি তাহার পূজারী হইয়াছিলেন। ইহার খুঁত ধরিবে কে? যে দেশেই যিনি প্রেমের বড় আদর্শ দেখাইয়াছেন, কেহই নদের চাঁদকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারেন না।

কিন্তু মহুয়া প্রেমবৃত্তির আদর্শে পৌঁছিয়াও আরও কতগুলি গুণ দেখাইয়াছেন, যাহা সাহিত্য বা সমাজে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। তিনি অসংযত অবাধ প্রেমের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াও সংযম এবং ভাবী চিন্তার প্রবৃত্তি সজাগ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মত উদ্ভাবনী শক্তিও মেয়েদের মধ্যে দুর্লভ।

প্রথমত মহুয়া রাজকুমারের প্রেমকে খুব বিশ্বাসের চোখে দেখিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বড়মানুষের দুলাল ছেলের এ একটী খেয়ালও হইতে পারে। তিনি নিজে মজিয়া কুলশীল বিসর্জন দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নদের চাঁদকে মজাইতে প্রস্তুত হন নাই। তিনি যদি ইঙ্গিতে তাঁহাকে বুঝাইতেন, তাঁহার পিতার সঙ্গে তিনি যাইবেন না, তাহা হইলে হোমরা বেদের কি সাধ্য ছিল, মহুয়াকে লইয়া সে স্থান হইতে পলাইয়া যাইতে? কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার এই সাহচর্য কুমারের পক্ষে শুভঙ্কর হইবে না; তাঁহার মাতা এবং স্বগণ কেহই এই প্রেমের প্রশ্রয় দিবেন না, হয়ত তিনি রাজ্যপদ, কুলশীল হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব হইবেন। তাহার পর বড়মানুষের খেয়াল; যেমন শতকরা ৯৯ জনের হয়, কতদিন পরে যদি রাজকুমারের খেয়াল ছুটিয়া যায়, তবে তাঁহার কি গতি হইবে? তখন তিনি দেখিবেন, বেদের মেয়ের উপর তাঁহার আর অনুরাগ নাই, অথচ তাঁহার জন্য

তিনি সম্পূর্ণরূপে রিক্ত হইয়া সর্বস্ব বঞ্চিত হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! তাঁহার এই অবস্থা মহুয়া কল্পনা করিতেও শঙ্কিত হইয়াছিলেন। প্রকৃত ভালবাসার ধর্ম এই যে, তাহা প্রনয়ীর ইষ্টচিন্তাকে সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখে, এই প্রেরনায় মহুয়া নিজে সর্বস্ব বঞ্চিত হইয়াও রাজকুমারের যাহা ইষ্ট তাহা নিজের সাময়িক সুখের প্রবৃত্তি অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং এই জন্য তাঁহার বিরহে মৃত্যুকে নিঃশব্দে বরণ করিয়া লইবার জন্য স্বীয় বন্যকুটিরে হোমরার সহিত প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। প্রণয়ীর এই ভবিষ্যৎ ইষ্ট কামনা তাঁহার প্রেমের একটী অঙ্গ, আমরা ইহার পরে আরও পরিষ্কার করিয়া দেখাইব।

প্রতি বিপদের মুখে মহুয়া যে উদ্ভাবনী শক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও সচরাচর মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না, এজন্য কোন উপায়ই তাঁহার অগ্রাহ্য হয় নাই। কৌশলে হনন, নৌকার ভরাডুবি করিয়া ধনেপ্রাণে শত্রুর সর্বনাশ, এ সমস্ত উপায় হিসাবে তাঁহার গ্রহণীয় হয়েছিল। সদাগরকে তিনি ভালবাসার ভান দেখাইয়াছিলেন, সন্ন্যাসীকেও তিনি মিথ্যা ভরসা দিয়াছিলেন, 'আমার স্বামীকে বাঁচাইয়া দাও, আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব'। মোট কথা তাঁহার প্রাণের দেবতাকে লাভ করা ও তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যখন যে প্রয়োজন হইয়াছে তাহা তিনি করিয়াছেন। তাহাতে মিথ্যা কথা, লোকহত্যা ও পরের সর্বস্ব লোপ – এসকল কার্য হইতে তিনি বিরত হন নাই। এই রমণীর মত সর্ববিপদে নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া রঙ্গমঞ্চে অগ্রসর হইতে কে কোন নারীকে দেখিয়াছে?

যখন সন্ন্যাসীর হাতে লাঞ্ছিত হইয়া স্বামীর প্রাণনাশের প্রচুর সম্ভাবনা তিনি দেখিলেন, তখন সম্পূর্ণরূপে অসহায় কঙ্কালসার উঠিতে বসিতে আশক্ত নদের চাঁদকে পৃষ্ঠের উপর ফেলিয়া শিকার লইয়া পলায়নপর বাঘিনীর মত তিনি পর্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া পর্যটন করিতে লাগিলেন। বঙ্গনারীর এই অপূর্ব দৃশ্য আর কোথায় কে দেখিয়াছে? প্রাচীন সাহিত্যে বাঙ্গালী রমণী অনেকটা সিতার ছাঁচে ঢালা; তাঁহার সহিতে, প্রাণত্যাগ করিতে, প্রেমের জন্য যথাসাধ্য আত্মসমর্পণ এমনকি প্রাণত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত! কিন্তু এই পাহাড়িয়া রমণীর মত বিপদের সময় অলৌকিক উদ্ভাবনী শক্তি ও আশ্চর্য মৌলিকতা কে কবে দেখাইয়াছে? মহুয়া-চরিত্র জলে ভাসা পদ্মফুল নহে, বায়ুচালিত তৃণ নহে, প্রেমের স্রোতে নিমজ্জমান একখানি স্বর্ণ-ডিঙ্গা নহে, এই চরিত্র আগাগোড়া মৌলিক রহস্যাবৃত। বঙ্গসাহিত্যে কেন, অন্য কোন সাহিত্যে ইহার জোড়া আছে বলিয়া আমারা জানি না। এজন্য অধ্যাপক স্টেলা ক্রামরিশ বলিয়াছেন, 'ভারতীয় সাহিত্য আমি যতিটা পড়িয়াছি তন্মধ্যে মহুয়ার মত আর একটী চিত্র আমি দেখি নাই।'

... মহুয়া নদের চাঁদের কি গুণ দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন? তিনি রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ প্রধানত রাজকুমারের ত্যাগ ও আন্তরিকতার উপর, আস্থামূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যেদিন কংস নদীর পাড়ে উঠিয়া তিনি নদের ঠাকুরকে খুঁজিয়া পাইলেন না সেদিন তাঁহার অনুরাগের কারণ বিলাপচ্ছলে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন –

'রাজপুত্র হইয়া যে আমার জন্য ভিখারী হইয়াছে, এত ধনদৌলত, এত বংশের মর্যাদা, বড়মানুষের ছেলের এত প্রলভন যাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, আমার জন্য যে সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুক হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে ছাড়া আমি কেমনে থাকিব? সে যে আমার গলার হার ছিল –

'দরিয়ায় পড়ে গেছে আমার গলার হার।'

গুণ-উপলব্ধির উপর এই ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এজন্য এই প্রেম এত দৃঢ় ছিল! ইহা চোখের নেশা নহে।

বাংলার পুরনারী, দীনেশচন্দ্র সেন

(সুদীপ্ত মুখার্জি, ইন্সটিট্যুট অফ ফিসিক্স)